১২.১ বিজ্ঞান-বিপ্লব ও তার স্বরূপ

১৯৫০-এর দশকে আধুনিক পৃথিবীর উত্থানের একটি দিকচিহ্ন হিসেবে ঐতিহাসিক মহলে বিজ্ঞান-বিপ্লবের আলোচনা শুরু হয়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি এই প্রায় দুশো বছর ধরে মানুষের চেতনায় বিশ্বচরাচর সম্পর্কে যে নতুন চিন্তা স্থান পেয়েছিল, তাকেই আমরা বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগ বলে সাধারণত চিহ্নিত করি। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে কোপারনিকাস বা গ্যালিলিও-র মতো বৈজ্ঞানিক, যাঁরা এই রূপান্তরের প্রাণপুরুষ, তাঁরা কতটা তাঁদের চিন্তার বৈপ্লবিক অভিঘাত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তা নিয়ে সংশয় আছে। আধুনিক ঐতিহাসিক যেভাবে বিজ্ঞান-বিপ্লবকে একটি ধর্মবিযুক্ত যুগদর্শনের স্রষ্টা হিসেবে মনে করেন, সেই অর্থে আধুনিক যুগের প্রারম্ভের এই বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মের সঙ্গে তাঁদের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার কোনো সংঘাত দেখেননি। এই পার্থিব জগতের গতি-প্রকৃতি তাঁরা ব্যাখ্যা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পার্থিব জগৎ তাঁদের দৃষ্টিতে ছিল ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আধুনিক ঐতিহাসিক যখন অতীতের এই বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে একধরনের বস্তুতান্ত্রিক, নিরীশ্বরবাদী চৈতন্যের উৎস খোঁজেন, তখন তাঁরা তাঁদের বর্তমানের অবস্থান থেকে অতীতের দিকে ফিরে তাকান। কীভাবে চেতনার স্তরে এই পার্থিব জগৎ ধর্মীয় কল্পনার ঐশ্বরিক বিশ্বচরাচর থেকে বিচ্ছিন্ন হল, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা অতীতের বিজ্ঞানসাধকদের অবদান মূল্যায়ন করেন। এক অর্থে 'বিজ্ঞান-বিপ্লব' এই ধারণাটা আধুনিক ঐতিহাসিকের সৃষ্টি।

যখন 'বিজ্ঞান-বিপ্লব' কথাটা ব্যবহার করা হয় একটা বিশেষ সময়কে মনে রেখে, তখন তিনটি ভিন্ন স্তরে এই পরিবর্তনকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। প্রথমত, এটা এমন এক ধরনের পরিবর্তন যখন বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে নতুন চেতনা যেন একেবারে আলাদা এবং সে অর্থে চিন্তার জগতে এ হল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। *দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য* হল যে, এই চেতনার নিয়ন্ত্রণ ছিল বিজ্ঞানের হাতে। ধর্মীয় দর্শনের ভূমিকা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এর ফলে যে নতুন বিজ্ঞানের উত্থান ঘটেছে, তা আধুনিক সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং নীতিবোধের জন্ম দিচ্ছে। Herbert Butterfield বিজ্ঞান-বিপ্লব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলছেন "It outshines everything since the rise of Christianity and reduces the renaissance and the reformation to the rank of mere episodes. It looms large

as the real origin of the modern world." বাটারফিল্ড আধুনিক বিজ্ঞানের স্রষ্টাদের দেখেছেন এক ভিন্ন প্রজন্মের অনুরাগীর দৃষ্টিতে। প্রথম দিকের ১৯৬০-এর দশকের ইতিহাস নিয়ে লেখাপত্র এই সুরেই বাঁধা হয়েছিল। নিজেদের জীবনকে বুঝতে গিয়ে তাঁরা পিছু হেঁটেছিলেন। কোপারনিকাস কিংবা গ্যালিলিও সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁরা দেখাচ্ছেন কিভাবে এঁরা সে সময়ের সমাজের বিস্তর বাধা অতিক্রম করে এই নতুন বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিংশ শতকের সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার বার্টলড ব্রেস্টের (Brecht) *'The Life of Galileo'* তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসবীক্ষায় নতুন কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছে। আধুনিকতার সঙ্গে সে যুগের বিজ্ঞান-সাধনার যে সরল সমীকরণের সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, সম্প্রতি সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের আধারে বৈজ্ঞানিকদের মনন এবং মানসিকতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর ফলেই প্রশ্ন উঠেছে যে, তাঁদের জীবনদর্শনের সঙ্গে আধুনিক জীবনদর্শনের মিল কতটা। সম্প্রতি তা নিয়ে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। সাম্প্রতিক কালে স্টিফেন শ্যাপিন (Steven Shapin) বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে বিজ্ঞান-বিপ্লব কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া বৈপ্লবিক নাটকীয় ঘটনা নয়। এক দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন চেতনার প্রসার ঘটেছিল, আর এই বিবর্তনের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমাদের ফিরে যেতে হয় মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে। এতদ্‌সত্ত্বেও বোধ হয় একথা বলা প্রয়োজন যে ষোড়শ শতকে শুরু হয়ে সপ্তদশ শতকে যে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ইউরোপের সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছিল, তা অ্যারিস্টটলীয় প্রকৃতি বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy)-এর মূলে আঘাত করেছিল। এই ধ্রুপদী অ্যারিস্টটলীয় চেতনা যে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের মধ্যে সীমিত ছিল তা নয়, সাধারণ মানুষও এতে বিশ্বাস করতেন। অ্যারিস্টটলের ভাবনায় বিশ্বচরাচরের সীমানা ছিল নির্দিষ্ট। গ্যালিলিও, কেপলার এবং নিউটন যে সৌরমণ্ডলের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তার অসীম বিস্তার মানুষকে মোহিত করেছিল। সৌরমণ্ডলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা মর্ত্যের সঙ্গে আকাশের জ্যোতিষ্কের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছিলেন। ফলে অ্যারিস্টটল যেভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন—একদিকে নিখুঁত স্বর্গ, অন্যদিকে নানা দোষে দুষ্ট মর্ত্য—এই ধারণা ভেঙে গেল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই চেতনার একটা নাটকীয় প্রভাব পড়েছিল।

পাশাপাশি গাছপালা এবং জীবজন্তু নিয়েও যে ধরনের বিদ্যাচর্চা চলছিল, তাতে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের এতদিনের প্রচলিত ধারণাগুলো দ্রুত পাল্টে গেল। নানাধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নতুন ভাবনা সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছেছিল। ইংল্যান্ডে ১৬৬০ সালে Royal Society* প্রতিষ্ঠিত হয়। নিউটনের চিন্তার বিস্তারে

Royal Society-র একটা বড় ভূমিকা ছিল। সব মিলিয়ে নতুন বিজ্ঞান জন্ম দিয়েছিল এক প্রগতিতত্ত্বের। এই প্রগতিবাদ শুধুমাত্র বিজ্ঞানসাধনার সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনা করে তা শিল্পক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, যার অবশ্যাম্ভাবী ফল হল শিল্প-বিপ্লব।

আঠারো শতকের জ্ঞানদীপ্তির দার্শনিকেরা এই প্রগতিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নিউটনের যুগের বিজ্ঞানসাধনার মূল্যায়ন করেছেন। ঠিক যেমন প্রগতিবাদ নিয়ে ইদানীং নানা প্রশ্ন উঠেছে, ঠিক একই ধরনের সংশয় আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রকট হতে দেখি। প্রগতিতত্ত্ব ধরে নিয়েছিল যে আধুনিক বিজ্ঞান যে সংস্কৃতির জন্ম দিল, তা মধ্যযুগীয় বিদ্যাচর্চার থেকে উৎকৃষ্ট এবং উন্নততর। ঠিক যেমন রেনেসাঁসের মানবতাবাদীরা মনে করেছিলেন তাঁরা এক উন্নততর সভ্যতার প্রতীক। অনেক ঐতিহাসিকই মধ্যযুগ সম্পর্কে আর ততটা উন্নাসিক নন। তাই টমাস কুন যখন *'Copernican Revolution'* লেখেন, তিনি এই দুই ধরনের প্রকৃতি ভাবনার পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েও আধুনিক সৌর-কেন্দ্রিক প্রকৃতি চেতনাকে উচ্চতর জ্ঞানের নির্ণায়ক হিসেবে মর্যাদা দিতে রাজি নন। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানকে বলছেন একটু নতুন যুগ চেতনা, যা বিদ্যাচর্চা এবং বিজ্ঞানচর্চার নতুন পরিভাষাও ঠিক করে দিয়েছিল। কুনের ভাষায় এ হল 'Paradigm Shift'। অথবা এক ধরনের জীবনবোধ থেকে অন্য জীবনবোধে নিষ্ক্রমণ। তাঁর *'The Structure of Scientific Revolutions'*-এ এই বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়।

কুনের এই বক্তব্য বিজ্ঞান-বিপ্লব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নতুন করে ভাবিয়েছিল। এই বক্তব্যে এক ধরনের relativism আছে। মধ্যযুগীয় বিদ্যাচর্চা মধ্যযুগের সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রাসঙ্গিক। এটা একটা Paradigm। আধুনিক বিজ্ঞানচর্চাকেও এই বৃহত্তর প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যাতে Paradigm Shift-টা বোঝা যায়। ফলে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এক নতুন সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর, যা এই নতুন বিজ্ঞানচর্চার অদৃশ্য স্রষ্টা। এর থেকেই নানা প্রশ্নের জন্ম। সত্যি সত্যি কী আধুনিক বিজ্ঞান এক যুগান্তকারী ঘটনা? সে সময়ের ধর্মবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার কী কোনো যোগ নেই? ধর্ম ও বিজ্ঞানের সে যুগে কী সত্যিই পরস্পরবিরোধী অবস্থান? মধ্যযুগের দার্শনিকেরা কী সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানচর্চা থেকে দূরে ছিলেন, না যাকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞান বলি, তার প্রথম পদক্ষেপ আমরা মধ্যযুগেই লক্ষ করি?

ফলে বিজ্ঞান-বিপ্লব কথাটা নিয়ে আজকের ঐতিহাসিকরা ধন্দে পড়েছেন। তাঁদের সমস্যা আরও বাড়িয়েছে এক ধরনের বক্তব্য, যা আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের আগেই একটা প্রাক-বৈজ্ঞানিক মনন দেখতে পারছেন। একে বলা হচ্ছে 'Proto Science'। আধুনিক ভেষজশাস্ত্র গড়ে ওঠার আগেই অনেকেই নানারকম জরিবুটি বা রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে রোগ সারাতেন। তাঁরা কী বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসের কোনো চরিত্র নন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞান-বিপ্লব সম্পর্কে ইতিহাস-চিন্তার নতুন করে মূল্যায়ন শুরু হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে যাঁরা বিজ্ঞানের ইতিহাসের চর্চা করছেন, তাঁরা বিজ্ঞানসাধনার বৈচিত্র্য এবং বহুমাত্রিকতার সন্ধানে ব্যস্ত। এ প্রসঙ্গে দুধরনের ঐতিহাসিক আছেন। একদল রয়েছেন, যাঁরা বিজ্ঞানসাধনাকে মূলত বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস হিসেবে দেখতে চান, তাঁরা জোর দেন বিজ্ঞান সাধনার ওপর। কীভাবে কাল থেকে কালান্তরে অধীত বিদ্যার ওপর দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নতুন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। এঁদের বলা যেতে পারে *'Internalists'*, যাঁদের ইতিহাসচর্চার প্রধান উৎস হল বিজ্ঞানচর্চা সংক্রান্ত লেখাপত্র। আর এক দল আছে, যাদের বলা যেতে পারে *'Contextualists'*, যাঁরা সামাজিক প্রেক্ষিতের পটভূমিতে বিজ্ঞানসাধনার ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে সমস্ত বৈজ্ঞানিকই, তাঁদের জ্ঞানচর্চা সমাধা করেছিলেন একটি বিশেষ সামাজিক ক্ষেত্রে। তাঁদের কাছে ধর্ম, প্রচলিত বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, লেখাপড়ার পদ্ধতি এবং নানা ধরনের জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান-ইতিহাসের আলোচনার বিষয়। স্বভাবতই তাঁদের দৃষ্টি পড়েছে ধর্মবিশ্বাস এবং বিজ্ঞানসাধনার সম্পর্কের ওপর। বাটারফিল্ড (Butterfield)-এর মতন তাঁরা ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হিসেবে দেখেননি। বরঞ্চ ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যে একটা জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল, তার দিকে তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১৫৪৩ সালের একটি ঘটনা পৃথিবীর সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সে বছর কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন যে এই বিশ্বচরাচর সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে এই মহাকাশ জগতের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। বিজ্ঞানসাধনায় কোপারনিকাসের এই তত্ত্ব একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চেতনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। এর পরে দেড়শো বছর ধরে বিজ্ঞানসাধনায় যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল, তার থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। জ্যোতির্বিদ্যায় কোপারনিকাসের তত্ত্ব পরিমার্জন করলেন কেপলার। কেপলারের সিদ্ধান্ত ছিল যে জ্যোতিষ্কগুলি চক্রাকারে আবর্তিত হয় না, তাদের আবর্তনের পথটা হল ডিম্বাকৃতি। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে গ্যালিলিও মহাকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করলেন। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে এই জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করল যে পৃথিবীতে সব পদার্থেরই একটি গতি আছে, এবং এই গতিময়তা গাণিতিক বিশ্লেষণ দিয়ে বোঝা সম্ভব। এরই সূত্র ধরে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন 'মাধ্যাকর্ষণ' বা 'Gravitation'-এর কথা বললেন। বিজ্ঞান-সাধকেরা প্রাকৃতিক জগৎ এই নিয়ম আবিষ্কার করতে গিয়ে আধুনিক পদার্থবিদ্যার সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা এ জাতীয় চিন্তাকে 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করি। এই সৌরকেন্দ্রিক মহাকাশের ভাবনা প্রচলিত অ্যারিস্টটলীয় যে সিদ্ধান্ত ছিল, তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। এতদিনে বিশ্বচরাচরকে দুইটি পৃথক স্তরে বিভক্ত করা হত। চাঁদের ওপারে ছিল দেবতাদের জগত। তা সবরকম দোষমুক্ত ও ত্রুটিহীন। অন্য ক্ষেত্রটি হল নানা ধরনের দোষে ভরা, এবং এই ত্রুটিপূর্ণ জগতের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। মহাকাশকে এই দৈবক্ষেত্র ও ভূক্ষেত্র—এইভাবে বিভক্ত করার তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান বর্জন করেছিল। ফলে স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে প্রভেদও ঘুচে গিয়েছিল। যেভাবে ঈশ্বর এবং মানবের

মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের কথা সংস্কারবাদীরা প্রচার করলেন, এই নতুন তত্ত্ব স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের সমীপবর্তী করেছিল।

নিঃসন্দেহে এই ধরনের চিন্তার একটা বৈপ্লবিক মাত্রা আছে। কিন্তু বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক চিন্তার প্রসার ঘটেছিল বহু দিন ধরে নানা মুনির নানা মতের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই যে বিচিত্র ভাবনা, তার নানান বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা মৌলিক প্রতিপাদ্য ছিল। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকেরা করেছিলেন, তা মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসের স্তর থেকে উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছিল। তাই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অনেকেই বলছেন যে এর ফলে বিজ্ঞানসাধনা ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বিযুক্তি ঘটেছিল।